দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 17 MAR 1993
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২

ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ নয়—অবৈধ অস্ত্র ও কালো টাকার উৎস বন্ধ করতে হবে

কে, এম সোবহান

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উপাচার্যদের সংগঠন "বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ" প্রধানমন্ত্রীর কাছে অর্থাৎ সরকারের কাছে কয়েকটি সুপারিশ করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে (১) উপাচার্যদের নিয়োগ করা হবে নির্বাচনের মাধ্যমে নয়, তারা মনোনীত হবেন, (২) শিক্ষকদের রাজনীতি না করা, (৩) শিক্ষাঙ্গনে অন্ততপক্ষে ৫ বছর সব রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনের কার্যক্রম বন্ধ করা, (৪) ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস কঠোরভাবে দমন করার জন্য আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দান এবং অপরাধীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি ছাড়াই গ্রেপ্তার করা যাবে।

বর্তমানে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিশেষ করে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ময়মনসিংহ এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থার যে অবনতি হয়েছে তাকে সামনে রেখেই বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ সুপারিশগুলো করেছেন। সুপারিশগুলো কেবলমাত্র শিক্ষাঙ্গনের অবস্থাদৃষ্টে করা হয়েছে। বিজ্ঞ উপাচার্যরা দেশের সার্বিক অবস্থার কথা ভাবেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রশান্ত মহাসাগরের বিচ্ছিন্ন দ্বীপমালা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জনাকীর্ণ বাংলাদেশেই অবস্থিত। সেখানে যারা পড়ান এবং পড়তে যান তারা সকলেই বাংলাদেশেরই লোক। বাংলাদেশের সার্বিক আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি কি, বাংলাদেশের রাজনীতির অবস্থা কি, রাজনীতিতে অরাজনৈতিক ধনাঢ্য ব্যক্তি, চাটুকার এবং টাউটদের অবস্থান কি এসবের ভিত্তিতে তারা যে ঐ সুপারিশগুলো করেছেন তা মনে হয় না।

'৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত হয়। পরিষদ এর পরিবর্তন চান। নির্বাচনের কোন বিকল্প নেই। নির্বাচন পদ্ধতি বাতিল করার অর্থই হচ্ছে প্রশাসনিক প্রধানের আস্থাভাজন লোকের নিয়োগ। '৭৩-এর আগে সেই পদ্ধতিই চালু ছিল এবং কারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য হয়েছেন আইয়ুব-মোনেমের আমলে তা বাংলাদেশের ছাত্র-শিক্ষকরা ভালভাবেই জানেন। আইয়ুব-মোনেমের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা ছাত্র রাজনীতিকে পরিচালিত করতে চেয়েছেন সরকারের সমর্থনে। সেই কারণে একটি ছাত্র প্রতিষ্ঠানের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। যার ভূমিকাই ছিল ছাত্রদের উপর সাদা পোশাকের পুলিশী ব্যবহার। নির্বাচন সম্পর্কে স্পর্শকাতর হওয়া একটি গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে না। বৃটিশ শাসনামলে এ ধরনের মনোনয়নের ব্যবস্থা ছিল অনেক ক্ষেত্রে এবং তার কি ফল হয়েছিল তা সকলেরই জানা। কয়েক মাস আগে সংসদে ত্রিশজন মহিলার পরোক্ষ ভিত্তিতে সাংসদ নির্বাচনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একটি রীট করা হয়। সেই রীট মামলার রায়ে বিদ্যমান প্রথা টিকে যায় তার একমাত্র কারণ সাংবিধানিক বিধান। সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদে নারী বা শিশুদের জন্য বিশেষ বিধান করার ক্ষমতা রাষ্ট্রকে দেয়া হয়েছে। মনোনয়নের প্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা — পাকিস্তান আমলে যে আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হত তাকে আমরা কালাকানুন বলতাম— প্রত্যেক ব্যবস্থারই কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে, এ ব্যবস্থারও আছে। তাই বলে এ ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে অতীতের কালাকানুনের যুগে ফিরে যেতে হবে তা কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।" অন্যান্য শিক্ষকরাও এ বিষয়ে ঐ একই মত প্রকাশ করেছেন।

সুপারিশে বলা হয়েছে শিক্ষকদের রাজনীতি না করা। রাজনীতি বলতে পরিষদ নিশ্চয়ই দলীয় রাজনীতির কথাই বুঝিয়েছেন। এর বিরুদ্ধে বলতে যেয়ে ডঃ রঙ্গলাল সেন বলেছেন, "একজন ব্যক্তিকে রাজনীতি করতে না দেয়া জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার বিরোধী।" পরিষদ কিভাবে এ ধরনের সুপারিশ করে তা বোধগম্য নয়। বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের (তৃতীয় ভাগ) ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা ও বিবেকের এবং বাক স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। ৩৯ (২) (ক)-তে বলা হয়েছে, "প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।" সংবিধানের অনুচ্ছেদে সকল নাগরিককে সংগঠন করার অধিকার দেয়া হয়েছে এবং ৩৭ অনুচ্ছেদে সমাবেশ, জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করবার অধিকার দেয়া হয়েছে। আইন করে সংবিধান লংঘন করলে সে আইন আদালতে বাতিল হয়ে যায়, এমনকি সংবিধান সংশোধনীও বাতিল হয়ে গেছে উচ্চ আদালতের রায়ে। জেঃ এরশাদের অষ্টম সংশোধনীর একাংশ সুপ্রীম কোর্টের (আপীল বিভাগের) রায়ে বাতিল হয়ে যায়। পরিষদ বোধ করি স্মরণে রাখেনি কিভাবে সরকারি দলের রাজনীতিতে শিক্ষকদের প্রলুব্ধ করা হয় এবং কিভাবে দলীয় রাজনীতির শিকার হন কেবল শিক্ষকই নয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও। ইদানীংকালে দু'জন সিনিয়র কূটনীতিককে আইনের অপব্যবহার করে দলীয় রাজনীতি চরিতার্থ করার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অবসর দেয়া হয়েছে। একথা কারও অজানা নয় যে, সরকারি দলের নীতির সঙ্গে, নির্দেশের সঙ্গে একমত না হলে চাকরিচ্যুত, বাধ্যতামূলক অবসরদান অথবা অসুবিধাজনক জায়গায় বদলি করা হয় সরকারি কর্মচারীদের। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হচ্ছে। এ কথাও জানা কিভাবে দলীয় সংগঠনে যোগ না দেয়ার জন্য বা বিরোধিতা করার জন্য ডাক্তারদের চাকরিতে ওলট পালট করা হচ্ছে। ডঃ রঙ্গলাল সেন বলেছেন, "শিক্ষক রাজনীতি কলুষিত হচ্ছে তাদের জন্য যারা ব্যক্তিস্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংস্থায় নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধি করতে চায়, কিন্তু সে যোগ্যতা তাদের নেই। শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ নয়, প্রয়োজন হচ্ছে যোগ্য ব্যক্তিরা যেন যোগ্য পদে আসতে পারেন এবং শিক্ষকরা যাতে সুস্থ ধারায় রাজনীতির বিকাশ ঘটাতে পারেন সে উদ্যোগ নেয়া। অযোগ্য ব্যক্তিরা যখন কোন পদে আসে তখন সেই ব্যক্তি পদে থাকার স্বার্থে সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেয়। ফলে শিক্ষক রাজনীতি ও ছাত্র রাজনীতি কলুষিত হয়। আর এটাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে সরকার শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে তার দায়িত্ব এড়াতে চাচ্ছে।" (সংবাদ ১০-৩-৯৩) শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করার চাইতে পরিষদের সুপারিশ করা উচিত ছিল শিক্ষকদের দলীয় স্বার্থে রাজনীতিতে ব্যবহার বন্ধ করা। পরিষদ কি বলতে পারবে যে, দলীয় কারণে শিক্ষকদের ব্যবহার করা হচ্ছে না। শিক্ষকরা রাজনীতি করে নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতার কাছাকাছি যেয়ে ব্যক্তিস্বার্থের জন্য রাজনীতির মুখোশ পরেন। অতীতে দেখা গেছে কিভাবে উপাচার্য থেকে সিনিয়র শিক্ষকরা, হাইকোর্টের বিচারপতি ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন এবং গণহত্যার সাফাই গাইতে গেছেন দেশে বিদেশে। এদের কেউই প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থে নিজেদের রাজনীতিতে ব্যবহৃত হতে দিয়েছেন। বর্তমানেও অনেক দৃষ্টান্তই দেয়া যেতে পারে।

পরিষদ সুপরিশ করেছে শিক্ষাঙ্গনে অন্ততপক্ষে ৫ বছরের জন্য সব রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠনের রাজনীতি বন্ধ করার। বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতি অত্যন্ত গঠনমূলক ভূমিকা রেখেছে যখনই জাতি সংকটের মুখে গেছে। '৪৮ সাল থেকে '৯০ সাল পর্যন্ত যখনই জাতি সংকটের মুখোমুখি হয়েছে তখনই ছাত্ররা এগিয়ে এসেছে সেই সংকটের নিরসনে। অতীতের কথায় না যেয়ে যদি ৯০-এর গণআন্দোলনের কথাই ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে যে যখন দেশের প্রধান দলগুলো এবং তার সঙ্গে ছোট ছোট দলগুলো বহুধা বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহে লিপ্ত থেকে কোন যৌথ কর্মসূচী দিতে ব্যর্থ হচ্ছিল স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে, তখন ছাত্রসমাজই অকুতোভয়ে এগিয়ে এসেছিল। বিভিন্ন দলের অঙ্গসংগঠন হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের মধ্যে সমঝোতায় আসে এবং একই ব্যানারের নীচে আন্দোলন করতে যেয়ে পুলিশ কর্তৃক নিগৃহীত হয়। তারপর থেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনের মোড় ঘোরে এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সম্ভব হয়।

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ নয়, যেটা প্রয়োজন তা হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র রাজনীতির উপর পুনঃ কর্তৃত্ব স্থাপন। যে সব দলের অঙ্গসংগঠন ছাত্র রাজনীতি করছে সে দলগুলোই দেশের সরকার এবং বিকল্প সরকার গঠন করেছে। দুই প্রধান দল যদি ছাত্র-রাজনীতিকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন তাহলেই ছাত্র রাজনীতি থেকে সন্ত্রাসী এবং রাজনৈতিক টাউটদের বিদায় করা সম্ভব হবে। রাজনৈতিক দলগুলো জোর করে বলতে পারবে না যে তাদের নিয়ন্ত্রণের অধীনে আছে ছাত্র সংগঠনগুলো। রাজনৈতিক দলগুলো বাধ্য হচ্ছে ছাত্র রাজনীতিতে সন্ত্রাসের প্রশ্রয় দিতে। গত বছরেই দেখা গেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের উপদলীয় কোন্দলকে কেন্দ্র করে কি সন্ত্রাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়ে গেল যার ফলে ২ জনের অকালমৃত্যুও হলো। রাজনৈতিক দলের আত্মকলহের ফলেও ছাত্রনেতা খুন হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যদি গণতন্ত্রের চর্চা হয়, নেতৃত্ব স্থির হয় নির্বাচনের ভিত্তিতে, তাহলেই সম্ভব ছাত্র সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করা। জাতীয় রাজনীতিই অসুস্থ অগণতান্ত্রিকতার শিকার। জাতীয় রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রচলিত হলেই ছাত্র রাজনীতিতেও সুস্থতা ফিরে আসবে। তার জন্য শিক্ষক-ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার দরকার নেই।

সন্ত্রাস সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরে। সন্ত্রাস দমনের জন্য সরকার কালাকানুন তৈরি করে ও বজায় রেখেও সন্ত্রাস দমন করতে পারছে না। প্রতিদিন সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় সন্ত্রাসের খবর প্রকাশিত হচ্ছে। সন্ত্রাস দমনে সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করার জন্য উপরওয়ালাদের হুকুমের অপেক্ষা করে কেননা তাদের নিজেদের চাকরির নিরাপত্তা নেই। সরকারি দলের কোন সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার হলে গ্রেপ্তারকারী কর্মকর্তা সরকারি দলের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। কাজেই সন্ত্রাসীরা স্বাধীনভাবে তাদের সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। একটি নির্বাচিত সরকারের আমলে এ অবস্থা কোনক্রমেই কাম্য নয়। এতে গণতন্ত্রের বিকাশ ব্যাহত হয়ে দেশ এক অনিশ্চিতের পথে যাত্রা করছে। সন্ত্রাস দমনে সরকারকে দৃঢ়ভাবে আইনের শাসন প্রয়োগ করতে হবে। প্রশাসনকে নিরপেক্ষ হতে হবে। সরকারী দলকে দেশের দিকে তাকাতে হবে। দেশের স্বার্থে কাজ করতে হবে, দলের স্বার্থে বা ব্যক্তির স্বার্থে নয়। কালো টাকা এবং অবৈধ অস্ত্রের উৎসে আঘাত করতে হবে। পরিষদের সুপারিশ খণ্ডিত চিন্তার ছবি।